প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের
পাঁচ হাজার শব্দের সারাৎসার

অভিসন্দর্ভের বিষয়

বিনির্মাণবাদের প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গল কাব্যের রূপ ও রূপান্তরের অনুসন্ধান

গবেষক

আনন্দময় ভট্টাচার্য

রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা: R-14RS02110052, Dated: 12th May 2016

গবেষণা নির্দেশক

ড. সন্দীপকুমার মণ্ডল

অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০ ০৭৩
২০১৮

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৭

প্রথম অধ্যায় : বিনির্মাণবাদ এবং মনসামঙ্গল কাব্যের নানা রূপ ৮-১৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমকালীন চিন্তাবিশ্ব ও ইতিহাস প্রবাহ : জাক দেরিদা ও বিনির্মাণবাদ ৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনির্মাণবাদ : পাঠপ্রক্রিয়া হিসেবে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গলের কবি : কাহিনির বিনির্মাণ ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আধুনিক বাংলা নাটক ১৬-১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাটকে বিনির্মিত অন্ধকার : মনসার জন্ম, মনসার অস্তিত্ব ১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনসা কথা : নাটকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিনির্মাণ ১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্প ও আদর্শের নতুন ‘পালা’ : নাটকে বিনির্মিত দ্বান্দ্বিক দর্পণ ১৭

তৃতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য ১৮-২০

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে মনসা মঙ্গল : বিনির্মিত স্বর্গ থেকে পাতাল ১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে বিনির্মিত বেহুলা : ‘আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী’ ১৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহনশীলতা থেকে প্রতিবাদে বিনির্মিত নারী : ছোটগল্পে ‘বেহুলা’ ২০

চতুর্থ অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আধুনিক বাংলা কবিতা ২০-২২

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেহুলার শাড়ি : আব্রুর নতুন সংজ্ঞা **২১**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষমতার বিপক্ষে লড়াই ও স্বাধীনতার নির্ঘোষ : কবিতায় মনসামঙ্গল **২১**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অজৈবের জৈব স্বপ্নবিলাস : কবিতায় সপ্তডিঙ্গা মধুকর ও অন্যান্য ২২

পঞ্চম অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : চলচিত্র ও অন্যান্য সংরূপ ২২-২৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ২৩-২৫

গ্রন্থপঞ্জি ৩০-৩৪

বিনির্মাণবাদের প্রেক্ষিতে
মনসামঙ্গল কাব্যের রূপ ও রূপান্তরের অনুসন্ধান

(প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের পাঁচ হাজার শব্দের সারাৎসার)

ভূমিকা

সময়ের প্রসবযন্ত্রণা ভিন্ন সাহিত্যে সৃজন অসম্ভব। সময়ই গড়ে নেয় সমসাময়িক সাহিত্যের আদল, অস্থি, অস্তিত্ব। প্রাচীন অথবা মধ্যযুগীয় থেকে অধুনান্ত সাহিত্যের আঁতের কথা সেটাই। কালচক্রে বিলীন হয় অতীত সৃজনের রাজপাঠ। আবার সময়ের সন্ধানী চোখ খুঁজে নেয় আপাত অচল পূর্বসৃজনের মধ্যে সুপ্ত সমকালোচিত প্রাসঙ্গিক সৃজন ও অর্থের সম্ভাবনা। চলতে থাকে কালক্রমিক সাহিত্যের পরম্পরা। তৈরি হয় নব নব বয়ানের ইমারৎ। কালে কালে তার দিকেও ধেয়ে আসতে থাকে সংশয় আর পরিপ্রশ্নের মৎকুণ। বিনষ্ট হয় প্রতিষ্ঠিত অর্থের পিকতান। তাই নতুন শব্দের ব্যবহারের থেকে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে শব্দের নতুন ব্যবহার। সাহিত্যবস্তুর মৌলিক কাঠামোর মধ্যে শব্দলগ্ন অর্থের আত্মঘাতী সম্ভাবনাকে স্বীকার না করলে সাহিত্যের কালজয়ী হয়ে ওঠার আর কোনো পথ নেই উত্তরাধুনিকতার এই সমকালে। বিনির্মাণবাদ সাহিত্যের শব্দনির্মিত কাঠামোর মধ্যে অর্থের সেই আত্মঘাতী সম্ভাবনাকে বহুমাত্রিক করে তোলে। বহুরৈখিক করে তোলে সাহিত্যের অর্থগত বয়ানের নানা স্তরকে। মনসামঙ্গল কাব্যকে বিনির্মাণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করার দরকার তার মধ্যে সুপ্ত ওই অর্থগত বহুরৈখিকতাকেই উন্মুক্ত করার জন্য। তদ্‌ভিন্ন কালান্তরের সাহিত্যপাঠের মধ্যে এই কাব্যের মহাকালের আশীর্বাদ প্রাপ্তির অন্য উপযুক্ত পন্থা নেই বলে আমাদের বিশ্বাস।

নিঃসন্দেহে বাংলা মধ্যযুগের কাব্যধারাগুলির মধ্যে অন্যতম মঙ্গলকাব্যধারা। কারণটা অবশ্যই এই কাব্যধারার বিস্তার। শ্রেণিগত এবং ভৌগোলিক। আর এই কাব্যধারার জনপ্রিয় শ্রেণি হল মনসামঙ্গল। মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনিই সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত। কাহিনিটির জনপ্রিয়তার মধ্যে একটা বাস্তব ঘটনার আনুকূল্য থাকতেও পারে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে ‘বাংলা

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, প্রাসঙ্গিক কারণে তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

> "ইহা বাংলাদেশের রামায়ন। সর্পপূজার জনপ্রিয়তা ইহার ব্যাপক প্রচারের অন্যতম কারণ হইলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সম্পূর্ণ একটি কাল্পনিক কাহিনী সেই যুগে বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র কাহিনীগত ঐক্য রক্ষা করিয়া এমন প্রচার লাভ করিতে পারিত না। বিশেষত সেই যুগে কোনও কবিবিশেষের স্বকপোলোদ্ভাবিত কোনও সম্পূর্ণ অলীক কাহিনীর সমাজে এমন সমাদর লাভ করা সম্ভব ছিল না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টির সাহায্যে যে ইহার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ এ কথা সত্য যে, 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কবি মুকুন্দরাম ও 'অন্নদা-মঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবিশক্তি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনায় কদাচ নিয়োজিত হয় নাই।"[১]

আশুতোষবাবুর অভিমতের চুলচেরা বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণার অভিমুখ নয়। আমরা কেবল এই কাহিনির সত্যমূলকতার একটা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করলাম যা, কাব্যধারাটির প্রসার ও জনপ্রিয়তার কেন্দ্রীয় কারণ হতে পারে। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, বাইশ কবিদের সৃজন অনেক ক্ষেত্রেই কালান্তরের সাহিত্যচর্চায় প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। বিনির্মাণবাদী প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গল পাঠের প্রয়োজন সে আবেদন থেকেই উঠে আসে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি মনসামঙ্গলের বিনির্মাণবাদী পাঠপ্রচেষ্টা। কারণ পাঠপ্রক্রিয়া হিসেবে বিনির্মাণ একরৈখিক পাঠের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবাদ করে চলে। নির্ধারণ করতে চায় সৃজনের অন্তরে চাপা পড়ে থাকা বহুমাত্রিক পাঠ সম্ভাবনার চলমান ও নবায়মান তল।

বিনির্মাণবাদ বা বিনির্মাণ সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনার সঙ্গে জাক দেরিদা মোটামুটি সমার্থক হয়ে গিয়েছেন। এখানে একটা কথা আমরা বলে নিতে চাই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার মারণ রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে পাশ্চাত্য মননে একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল, যা পরবর্তী বৌদ্ধিক চর্চার ও তত্ত্ববিশ্বের মানচিত্রটাকেই বদলে দিয়েছিল। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল অস্তিত্ব। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল স্থিতি। অর্থের স্থায়িত্ব। যেখানে মারণাস্ত্রের আত্মপ্রকাশে মানবজীবন ও পৃথিবী নামক গ্রহটার অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সেখানে শব্দ (যাকে ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ চূড়ান্ত স্থায়ী) ও বাক্যের অর্থবোধের স্থায়িত্বও প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড়াবে,

তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাতই সেই স্থায়ী ইমারত গঠনের চিরাচরিত ভাবনা-চিন্তার পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। বিনির্মাণের চিন্তাগত ভিত্তিভূমিটা খুঁজতে গেলে আমাদের ঠিক এই সমতলে এসে দাঁড়াতে হবে।

ক্রমিক বা চলমান নির্মাণের প্রক্রিয়া হিসেবেই দেরিদা বিনির্মাণকে ব্যাখ্যা করেছেন। যাবতীয় সম্ভাবনাময় অর্থ, ভাষার, অভিজ্ঞতার, মানবিক সংযোগের যাবতীয় সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে মূর্ত ও সংশয়িত করে তুলতে চায় বিনির্মাণবাদ। ফলে প্রতিটা পাঠে, প্রতিবেদনের মধ্যে, ব্যাখ্যার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র নির্মাণ করেই পরমুহূর্তে তাকে প্রশ্নদীর্ন করে তোলে বিনির্মাণ। ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এ প্রসঙ্গে লিখছেন:

> "বিনির্মাণতত্ত্বের মধ্যে একধরণের ব্যাখ্যা বা interpretation সাহিত্যিক বা অ-সাহিত্যিক, থেকেই যাচ্ছে। এবং একটি text-এর ব্যাখ্যা কখনোই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।... কাজেই এই ধরনের রচনার পাঠ নিয়তই পরিবর্তনশীল বা transformational।"[২]

দেরিদার বিখ্যাত 'Of Grammatology' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকও সাহিত্যিক বিশ্লেষণে পাঠের অর্থগত অস্থায়িত্ব ও ক্রমচলমানতা প্রসঙ্গে 'Transletors Preface' অংশটিতে লিখেছেন:

> "...the structure preface-text becomes open at both ends. The text has no stable identity, stable origin.... each act of reading the text is a preface to the next."[৩]

মোটামুটি এই কথাটিকেই বিনির্মাণবাদের মূল কথা বলা যায়। এটি সময় ও মর্জি উভয় বিচারেই উত্তর-অবয়ববাদী ভাবনা। দেরিদা তাঁর মতবাদকে কোথাও সাহিত্য সমালোচনার আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠিত মতবাদের সঙ্গে সমসারণির বলে দাবি করেননি। বলা ভালো সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতি হিসেবে বিনির্মাণবাদকে দর্শনগত ভাবে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সমস্যাটা হল এই মতবাদ কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থগত প্রতিষ্ঠানকেই স্বীকার করে না। দেরিদা 'Free play' –তে বিশ্বাস রাখেন। 'কথন' আর 'লিখনের' পার্থক্য (Difference) আলোচনাতে ফার্দিনান্দ স্যসুরের (ফার্দিনান্দ স্যসুর : ১৮৫৭-১৯১৩) সঙ্গে দেরিদার এখানে মৌলিক প্রভেদ আছে। ফার্দিনান্দ স্যসুর লিখনের থেকে কথনের অর্থাভাসকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরপক্ষে দেরিদা সেই অর্থগত স্বীকৃতিও কথনের ক্ষেত্রে মেনে নিতে রাজি নন। কারণ, বিনির্মাণ আসলে কোনো

পদ্ধতি বা ভঙ্গী নয়; এটি একটি পাঠ প্রক্রিয়া। কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে আধিভৌতিক বা মেটাফিজিক্যাল ভাবনা-চিন্তার দাসত্ব করার বিপরীত চলমান প্রক্রিয়া এই বিনির্মাণ বা ডিকন্সট্রাকশন। দেরিদার মতে লিখন আর কথনের ভাষিক অর্থবোধের নিয়মের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ নেই। দুটি ক্ষেত্রেই বিধি-নিষেধ, সংবিধান মোটামুটি একই। এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই একটি অন্যটির থেকে অধিকতর শ্রেয় বা পবিত্রতর। পবিত্রতার কথা আসছে একারনেই যে, পবিত্রতাও এক ধরণের মেটাফিজিক্যাল চিন্তাস্তর থেকে জাত হয়। লিখিত রূপকে বলনের থেকে কম পবিত্র মনে করার পিছনে থাকতে পারে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অভিসন্ধি বা complicity। এখান থেকেই সম্ভবত ‘বাককেন্দ্রিকতা’-র উদ্ভব।

কোনো একটি বিশেষ পাঠ বা অর্থ বা কালগত সীমায় আটকে যাওয়াকে তথা কেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষাকে দেরিদা তাঁর ‘Of Grammatology’ গ্রন্থে ‘বাককেন্দ্রিকতা’ (Logocentrism) বলেছেন। এতে কোনো একক অর্থ বা ব্যাখ্যাগত মেরুকরণকে মেনে নিতে হয়। এই প্রবণতারই বিরোধিতা করেন দেরিদা।

উত্তর আধুনিকতারও যদি কোনো প্রান্তসীমা হয়ে থাকে, বিনির্মাণবাদের চলাচল সেই প্রান্তজুড়ে। কারণ উত্তরাধুনিকতা যেকোনো ধরণের আধিভৌতিক বা মেটাফিজিক্যাল অবস্থান নির্বাচনেরই বিরোধিতা করে থাকে। বিনির্মাণের পাঠগত অনুসরণেও সেই বিরুদ্ধতাই প্রকটতা লাভ করে। জাক দেরিদা বিনির্মাণকে যেকোনো প্রতিষ্ঠানেরই বিপরীতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এমনকি কোনো পাঠকৃতির নির্দিষ্ট সমালোচনা পদ্ধতি হিসেবে বিনির্মাণবাদকে তুলে ধরতেও তাঁর আপত্তি। তাঁর মতে বিনির্মাণকে তত্ত্বও বলা যাবে না। কারণ তত্ত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণও এক ধরণের মেটাফিজিক্যাল প্রচেষ্টা। নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে থাকে একটা অপরিবর্তনীয় অনড় প্রতিষ্ঠানের অভিব্যাক্তি। বিনির্মাণ সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করে। দেরিদার আলোচনার প্রক্রিয়াকে দেরিদা Grammatology বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বলতে আগ্রহী একারণেই। দেরিদার মতে চিহ্নতত্ত্বও অধিবিদ্যার কুহক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে না বলে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেও একটা অর্থগত প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করে নেওয়ার ইচ্ছে জাগে। একারণেই বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল স্যাসুরের মধ্যে। অধ্যাপক অমল বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

> “যদি চিহ্নতত্ত্বে কোনো কাজ না হয়, তাহলে ভাষাতত্ত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে ফলপ্রসূ হবে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন এক নতুন পদ্ধতির, যার সাহায্যে রচনার মধ্যে নিহিতা অধিবিদ্যার বীজ সম্পর্কে

অন্তত আমরা সজাগ থাকতে পারি। এই নতুন পদ্ধতি বা বিজ্ঞানকেই দেরিদা আখ্যা দিয়েছেন 'গ্রামাটোলজি' বা রচনার তন্ন তন্ন বিচার। এই নামটির আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্য দেরিদার নয়। উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি অভিধানিক লিত্রে (Litre) তাঁর অভিধানে 'গ্রামাটোলজি'র কথা উল্লেখ করেছেন।"[৪]

এই গ্রামাতোলজির মূল কৌশল হল ডিকন্সট্রাকশন বা বিনির্মাণ। অর্থাৎ বিনির্মাণ কোনো পদ্ধতি নয়। পদ্ধতি সেক্ষেত্রে গ্রামাতোলজিকে বলা যেতে পারে। বিনির্মাণ হল পথ। এমন একটা পথ বা পাঠপ্রক্রিয়া, যা কোনো নির্দিষ্ট অর্থের এলাকায় পৌঁছে দেয় না। বরং কোনো নির্দিষ্ট অর্থে নোঙর করার চূড়ান্ত বিরোধিতা করে।

প্রাগাধুনিক কাল থেকে মনসামঙ্গলের একটা কাহিনিই প্রতিনিয়ত পরিগ্রহণ করে এসেছে নতুন রূপ। আধুনিক সাহিত্যের সীমায় তা পঠিত হয়েছে আধুনিকসাহিত্যলগ্ন নানা সংরূপের (Genre) মধ্যে। মনসামঙ্গলের কাহিনির বিনির্মাণ ঘটেছে একালের নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতার মত আধুনিক সাহিত্যসংরূপের মধ্যে। বর্তমান গবেষণা সেই বিনির্মাণবাদী প্রেক্ষিতটিকে সামনে রেখে মনসামঙ্গল কাব্যের রূপ ও রূপান্তরণের অন্তরে প্রবেশ করতে চায়। সেকাল থেকে একালের পাঠক বা শ্রোতা স্রষ্টার আসন নিয়ে একই কাহিনিগত কাঠামোতে আচ্ছন্ন হয়ে কেন ও কীভাবে তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা (Interpretation অর্থে) দিলেন নতুন নতুন সংরূপকে আশ্রয় করে, এবং তার অব্যবহিত পরেই কীভাবে ভেঙে পড়ল পূর্ববর্তী অর্থের কাঠামো, বর্তমান গবেষণা তার একটি যুক্তিগ্রাহ্য রূপরেখা নির্মাণে আগ্রহী। আর সে কারণেই বিনির্মাণবাদের তাত্ত্বিক আলোচনার সারাৎসারটুকু বুঝে নিয়ে সেই পথেই আমরা মধ্যযুগের বহুল প্রচারিত কাব্যটিকে পড়তে চাই। আমরা একই সঙ্গে চাই আধুনিক নানা সংরূপের স্রষ্টাদের মনসামঙ্গল পাঠে সচেতন অথবা অসচেতন ভাবে প্রযুক্ত বিনির্মাণবাদের প্রেক্ষিতটি বুঝে নিতে।

গবেষণা পদ্ধতি

চিরাচরিত গবেষণা পদ্ধতির পরিচিত বিষয় যেমন, সাক্ষাৎকার বা সমীক্ষা বা তথ্য সংগ্রহ আমাদের বর্তমান গবেষণায় প্রযোজ্য নয়। একটি পাঠের ভিতর যে শব্দ-বাক্যের কাঠামো থাকে, তার বিপুল অর্থগত সম্ভাবনাকে মুক্ত করাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। তাই বিনির্মাণের দৃষ্টিকোণই বর্তমান গবেষণাকর্মের একমাত্র দৃষ্টিকোণ। এই বিশেষ পাঠ প্রক্রিয়াকেই আমরা বর্তমান গবেষণায় প্রধান উপকরণ (Critical Tool) হিসেবে

ব্যবহার করেছি। অধ্যায় থেকে অধ্যায়ান্তরে সংরূপ ও তার কাঠামোগত উপাদান ধরে ধরে আমরা বিনির্মাণবাদী নিবিড়পাঠ করেছি। নিবিড়পাঠের সঙ্গে সময়-সঙ্গতি রক্ষা করে গবেষণাটিকে যথাযথ ভাবে ঘনপিনদ্ধ রাখতে আমরা এক একটি সংরূপের জন্য সর্বাধিক তিনটি পাঠ (Text) নির্বাচন করেছি। মূলত এক একটি পাঠ (Text) অন্তর্গত অপ্রকাশিত অর্থের সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ শব্দ ধরে ধরে বিনির্মাণবাদী নিবিড়পাঠই বর্তমান গবেষণায় উপযুক্ত গবেষণাপদ্ধতি হিসেবে আমরা গ্রহণ করায়, গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা গবেষণালগ্ন বই এক্ষেত্রে আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাল-লব্ধ তথ্য স্থান বিশেষে প্রভূত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে আমাদের কাছে। যথাযোগ্য স্থানে তথ্যসূত্রে সে সমুদায় ঋণ স্বীকৃত হয়েছে। অধ্যায় শেষে যথোপযুক্ত আন্তর্জাতিক ও প্রচলিত পদ্ধতি মেনে তথ্যসূত্র সংযোজন করেছি আমরা। গবেষণা অভিসন্দর্ভের শেষ ভাগে সংযোজিত হয়েছে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও টীকাসূত্র।

প্রথম অধ্যায়

বিনির্মাণবাদ এবং মনসামঙ্গল কাব্যের নানা রূপ

প্রথমেই একটা আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা জরুরি যে, বিনির্মাণ কোনো তত্ত্বের নাম হয়ে উঠুক, সেটা এই মতধারার অনুপন্থীরাই চাননি। চেয়েছেন বিনির্মাণকে দেখা হোক একটা দৃষ্টিকোণ হিসেবে, পাঠের একটা রীতি হিসেবে। একটা ‘approach’বা একটা ‘way of reading a text’।

প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা বিনির্মাণবাদের তাত্ত্বিক মীমাংসা খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছি। আমরা মীমাংসা বলছি একারণেই যে, এই বিনির্মাণবাদ নিয়ে যথেষ্ঠ ধোঁয়াশা সমালোচক ও তাত্ত্বিক মহলে রয়েছে। বিনির্মাণবাদ অর্থের উপলব্ধির পরমুহূর্তেই তাকে নস্যাৎ করতে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে যাঁরা পাঠ ব্যাখ্যা করে সাহিত্য সমালোচক মহলে স্থায়ী নাম কিনতে চান, তাঁদের এই পদ্ধতি পছন্দ না হওয়ারই কথা। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যাও নিষ্পন্নের পরমুহূর্তেই প্রশ্ন-সংশয়িত হয়ে পড়বে। অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। তাই ওই পদ্ধতিতে পাঠ হয় না বলার একটা প্রচেষ্টা আছে পাঠক-সমালোচক মহলে। আমরা তাই সংশয়ের মীমাংসা করে নিতে চাই। দেখতে চাই বিনির্মাণবাদী পাঠ-প্রক্রিয়া আসলে কোন পথ পরিগ্রহের কথা বলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমকালীন চিন্তাবিশ্ব ও ইতিহাস প্রবাহ : জাক দেরিদা ও বিনির্মাণবাদ

বিনির্মাণবাদ নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে এর সমসাময়িক ইতিহাসের ক্রমিক প্রগতিটি পর্যালোচনা করে নেওয়ার দরকার আছে। আর এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম মহাযুদ্ধের সমকাল থেকেই সতর্ক ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন।

খুব সহজ করে বললে বলতে হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্বের দরবারে বিশ্বযুদ্ধের কোনো ধারণা ছিল না। বরং সে তাবৎ কালের যুদ্ধের যা ইতিহাস, তার ভিত্তিতে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা শিভ্যালরি কাজ করছিল মানুষের মনে, মননে। নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ যুদ্ধের ধারণা দুমড়ে মুচরে দিল বিশ্বযুদ্ধ। সর্বজনীন ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেল না জয়ী, পরাজিত, নিরপেক্ষ-কোনো পক্ষই। প্রাজ্ঞ মননে বারবার এই অনুভব জন্ম নিতে লাগল যে, পুরাতন যা কিছু ছিল পৃথিবীতে, তার বিনাশ সাধিত হয়ে গেছে। ফলে বদলে যেতে লাগল পাঠের গঠন এবং পাঠতাত্ত্বিক সমালোচনার পরিমণ্ডল।

১৯৪৭ সালে জাঁ পল সার্ত্রের ‘Situations’[৫] প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির এমন মননঋদ্ধ লেখা নিঃসন্দেহে সার্ত্রের নিষ্ঠ পাঠক দেরিদার মধ্যে আবেদন রেখেছিল চিন্তাকে গভীরতর করে তোলার। সাহিত্য ও সমাজকে লগ্ন করে সার্ত্রের এই প্রবন্ধগুলি অস্তিত্ববাদী চিন্তার সারাৎসার প্রকট করেছিল দেরিদার কাছে। ওই একই বছরে প্রকাশিত হয় আলব্যের ক্যামুর উপন্যাস ‘The Plague’।[৬]

শুধু সার্ত্রে বা ক্যামু নন, এই সময় গভীর ভাবনার ছাপ রাখছেন রোঁলা বার্ত, জাক লাঁকা, জাঁ ইপ্পোলিত, ক্লদ লেভিস্ট্রস প্রমুখ পাশ্চাত্য দর্শনের মহাপণ্ডিতবর্গ। ১৯৫৩ সালে যেমন ক্যামুর প্রবন্ধ সংগ্রহের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি প্রকাশ পাচ্ছে রোঁলা বার্তের ‘Writing Degree Zero’, প্রকাশ পাচ্ছে জাক লাঁকার ‘The function and field of speech and language in psychoanalysis’। ১৯৫৫সালে প্রকাশিত হচ্ছে জাঁ ইপ্পোলিতের ‘Studies on Marx and Hegel’ এবং ক্লদ লেভিস্ট্রসের ‘Tristesn Tropiques’।

এই সময় থেকেই বিনির্মাণবাদের প্রাথমিক ভাবনাগুলো জারিত করছে জাক দেরিদার মনন চিন্তনকে। সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি এই সময়ের ভাবনার ফসল (যদিও ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত) ‘Speech and Phenomena’ থেকে। ফ্রান্স তথা ইউরোপের দর্শন চিন্তার আবহটা তখন দ্রুত বদলাচ্ছিল। নতুন নতুন সমস্যা, নতুন

নতুন প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন, নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সামনে আসছিল অহরহ। ১৯৫৭ সালে প্রকাশ পেল ক্লদ লেভিস্ট্রসের বিখ্যাত বই 'Mythologies' এবং১৯৫৮সালে প্রকাশিত হয় 'Structural Anthropology'।[৭] এরই মধ্যে আর একজন ফরাসী ভাবুকের সৃজন ১৯৬১ সালে দেরিদার হাতে চলে আসে। সেটি হল মিশেল ফুকোর 'Madness and Civilization'।[৮] কম্যুনিস্টদের কয়েকটি স্থানে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে উত্থানের ও পতনের পরবর্তী ইতিহাস ঘেঁটে, কিছু কম্যুনিস্ট দেশের পার্টিনীতি বদল করে পুঁজিবাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করা দেখে এবং কিছু দেশ ও প্রদেশের কল্পিত আগামী কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের স্বপ্ন-দর্শন উপলব্ধি করে আমাদেরও সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ঠিক কোন অবস্থা থেকে ফুকোরা কম্যুনিস্টদের প্রতি আস্থা হারালেন।

এই প্রসঙ্গেই একটি আলোচনা আমরা প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করে উদ্ধৃত করতে ইচ্ছুক। আলোচনাটি খুব একটা প্রাচীন নয়। এরিক জন আর্নেস্ট হব্‌সবোম 'London Review of Books' নামক একটি রিভিউ জার্নালে 'Palmiro Togliatti: A Biography by Aldo Agosti translated by Vanna Derosas and Jane Ennis' (পালমিরো তোগলিয়াত্তির জীবনী) এবং 'IL sarto di Ulm: Una possibili storia del PCI by Lucio Margi' (ইতালীয় ভাষায় ইতালীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস) গ্রন্থ দুটির সমালোচনার শুরুটা করেছেন এইরকম:

> "The history of the 20th century Communist movements that never acquired State Power has been overshadowed by the extraordinary story of the rise and fall or self transformation of the regimes inspired by October Revolution. Within little more than 30 years of Lenin's arrival at the Finland Station, Russia had become a Superpower and one third of humanity was ruled by communist parties. There had been nothing like since the triumphal expansion of Islam in the Seventh century. Forty years later, all these regimes between the Siberian shores of the Pacific, the Baltic and the Adriatic had gone and the major Asian Communist Parties had recycled themselves into builders of capitalism. Except for two small and

somewhat eccentric states, nothing remained of the hope that the world of the future would be one of centrally planned socialist societies." [৯]

ইতিহাসের পক্ষপাতহীন পাঠক ও পর্যবেক্ষক মাত্রেরই এই অনুভব আসা স্বাভাবিক।

১৯৬২ সালে প্রকাশ পেল জাক দেরিদার প্রথম বই 'Edmund Husserl's Origin of Geometry : An Introduction'। হুসের্লের মূল বইটি জার্মান ভাষা থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেরিদা তাঁর গ্রন্থে যোগ করলেন একটি দীর্ঘ ভূমিকা। ১৯৬৫ সালে যখন তিনি একোলে নর্মাল সুপিরিয়রে দর্শনের অধ্যাপনা করছেন, তখন 'Tel Quel' (১৯৬০-১৯৮২) নামের একটি আঁভা-গার্দ সাহিত্য পত্রিকার অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হন।

১৯৬৬ সাল ফরাসী দর্শন-সাহিত্য-সমালোচনার খুবই উর্বর সময়। এই সময় প্রকাশ পাচ্ছে লুই আলথুজেরের 'For Marx', এমিল বেনভেনিস্টের 'Problems of General Linguistics', জাক লাঁকার 'Ecrits', মিশেল ফুকোর 'The Order of Things'[১০], রোঁলা বার্তের 'Critique Et Verite'[১১] প্রভৃতি বই। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হল দেরদার তিনটি বই; 'Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory of Signs', 'Of Grammatology', 'Writing and Difference'। এর মধ্যে প্রথম বইটি আগেই লেখা। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। বইটি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বইটিকে বলা যেতে পারে দেরিদার বিনির্মাণবাদের ধাত্রীগ্রন্থ। বিশ্বসাহিত্য-সমালোচনায় দেরিদার এই বইটির মতো জনপ্রিয় ও বহুপঠিত বই আর নেই। তৃতীয় বইটি আসলে দেরিদার ১৯৬৩ সালের ৪ মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার সংকলন। ফুকোর উন্মাদ সংক্রান্ত ভাবনাই এই আলোচনার প্রেক্ষণবিন্দু। এই বইটির মূল গুরুত্ব শুধু এর পাঠক প্রতিক্রিয়া নয়। বরং আমরা দেখেছি এই আলোচনাই ফুকোকে আরও দুটি গ্রন্থ রচনার প্রেরণা দিয়েছিল। একটি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'The Order of Things: An Archaeology of the Human Science', অপরটি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'The Archaeology of Knowledge'। দুটি গ্রন্থের মুখবন্ধে সে কথা ফুকো নিজেই জানিয়েছেন। ফুকো-দেরিদার এই পারস্পরিক ভাবনার আদান-প্রদান যে ফরাসী দর্শনকে অনেক সমৃদ্ধি দিয়েছিল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেরিদার 'Of Grammatology' বাদ দিয়ে অপর দুটি বই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে যথাক্রমে ১৯৭৩ ও ১৯৭৮ সালে।

১৯৭২ সালে প্রকাশিত হচ্ছে দেরিদার তিনটি বই। ‘Positions’, ‘Dissemination’, ‘Margins of Philosophy’। আমরা একথা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ফ্রান্সের পাশাপাশি মার্কিন চিন্তাবিদ মহলেও সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন তিনি। ইতোমধ্যে একটা অংশের লেখক ও সমালোচক বামপন্থী চিন্তার শূন্যতার সুযোগে উত্তর-মার্ক্সবাদী স্কুল গড়ে তুলতে সচেষ্ট হচ্ছিলেন। জাঁ বদ্রিলারের ‘The Mirror of Production’ বইটিতে এই উত্তর-মার্ক্সবাদের স্পষ্ট প্রক্ষেপণ লক্ষ্য করি আমরা। বরং দেরিদা এই সময় অনেকখানি মনোনিবেশ করেছেন তাঁর এতাবৎ প্রাপ্ত দার্শনিক দৃষ্টিকোণকে আরও জটিলতর অন্তর্বয়নের মধ্যে চালিত করার কাজে। ছুঁতে চাইছেন বহুত্বতার নতুন নতুন সীমান্ত।

তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ‘Glas’ বইতে।[১২] ১৯৭৫ সালে দেরিদা নিজেকে যুক্ত করছেন দর্শন পাঠের ফরাসী নিয়ামক সংস্থা ‘GREPH’ (Le Groupe de Recherche sur L’Enseignement Philosophique)-এর সঙ্গে। ১৯৭৫ সালে জে.এল. অস্টিনের একটি বই ‘How to do things with words’ নিয়ে লেগে গেল জন সার্লের সঙ্গে দেরিদার প্রবল বিতর্ক।সার্ল দেরিদা-বিরোধী সমালোচনায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। সরাসরি ঘোষণা করলেন:

> “Derrida’s writings are so obscure that it is too difficult to decipher for it to be taken seriously... With Derrida, you can hardly misread him, because he’s so obscure.”[১৩]

১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হল দেরিদার আর একটি আলোচিত বই ‘The Truth in Painting’, যেটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন জিওফ্রি বিনিংটন ও ইয়ান ম্যাকলিয়ড। চিত্রের বহুরৈখিকতা সাহিত্যপাঠ পদ্ধতির সমীকৃত সত্য হিসেবে দেখাতে পারলেন দেরিদা। ২০০৪ সালের ৮ অক্টোবর গত হয়েছেন দেরিদা। এই সময়কালের মধ্যে আয়ুষ্কালের শেষ প্রহর পর্যন্ত চিন্তাশীল ও সৃষ্টিশীল ছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনির্মাণবাদ : পাঠপ্রক্রিয়া হিসেবে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

বিনির্মাণবাদের আত্মপ্রকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর বীজ সন্ধান করতে গেলে আমাদের রাশিয়ার প্রকরণবাদের প্রতি প্রথম নজর পড়ে। এই সমালোচনারীতির প্রাথমিক বিধানগুলি ইউরিজ তিনজানভ (Jurij Tinjanov) এবং রোমান ইয়াকভসনই

নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁরা সাহিত্যে বিশেষত্ব প্রদানকারী অন্যান্য উপাদান, যেমন উপমা, তুলনামূলক উক্তি, বক্রোক্তি, পুনরুক্তি, অতিশয়োক্তি, এগুলিকে অনেক বেশি প্রকরণ হিসেবে গুরুত্ব দিলেন। কারণ এগুলি সাহিত্যবস্তু, এমনকি শব্দেরও তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলে। প্রকরণবাদীরাই চেয়েছিলেন সাহিত্যের পঠনপাঠন হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁদের মতে শিল্প সাহিত্য হল পূর্বোল্লেখিত নানা উপাদানের মাধ্যমে প্রাত্যহিকতাকে ক্রমে অপরিচিত করে তোলার প্রক্রিয়া। তার জন্য স্রষ্টাকে সাহায্য নিতে হয় এক ধরণের ‘impeded form’-এর। এই অপরিচয়ের বাধাপ্রাপ্তিই পরিচিত সাহিত্যিক উপাদানকে অপরিচিত সাহিত্য করে তোলে। এই প্রক্রিয়াকে প্রকরণবাদীরা ‘estrangement’ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ভাবনাই ছিল বৈপ্লবিক। কিন্তু নিজেদের অভিমতের সঠিক পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা তাঁরা করে যেতে পারেননি। সেটা অবয়ববাদে সম্ভবপর হল। তাই বলা যায় অবয়ববাদ আসলে প্রকরণবাদেরই একটা উত্তরণ।[১৪]

অবয়ববাদীরা পর্যবেক্ষণ করলেন সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা সুস্পষ্ট কাঠামো আছে। সেই কাঠামোটাকে বিশ্লেষিত করতে পাড়লেই বুঝতে পারা যাবে বিষয়টির সম্যক রূপ। এই কাঠামোর ধারণা না থাকলেই বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা যাবে এক ধরণের বিশৃঙ্খলা। আর সেই বিশৃঙ্খলাকে ঢাকতে বিশ্লেষক সাহায্য নেবেন আধিভৌতিক বা মেটাফিজিক্যাল শাসনের। এই অব্যবস্থা থেকে মুক্তি মিলতে পারে একমাত্র কোনো বিষয় সংগঠনের ছোট ছোট এককগুলিকে বিশ্লেষণ করলে। এই এককগুলিই হল অবয়ববাদীদের কাছে ‘চিহ্ন’ (Sign)। তার অবস্থান উপ্ত থাকে বিষয় আর বিশ্লেষকের সামূহিক গভীরতায়। তার বাহ্য শরীর হয়ে ওঠে ‘চিহ্নায়ক’ (Signifier)। ছবি, শব্দ, উচ্চারণ এই সবই সহজ করে বললে ‘চিহ্নায়ক’। সেই চিহ্নায়ক যে ভাবগত বা অর্থগত, আমরা যাই বলি না কেন, উপলব্ধি নিয়ে আসে, তাই ‘চিহ্নিত’ (Signified)। বিশ্লেষণের এই ত্রিমাত্রিকতাই অবয়ববাদের (Structuralism) মূল কথা। ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর তাঁর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় একেই বলেছিলেন ‘চিহ্নতত্ব’ (Semiology)। ক্লড লেভিস্ট্রস তাঁর মিথ সংক্রান্ত আলোচনায় একেই সংযুক্ত করেছিলেন সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে সে কথা আমরা আলোচনা করেছি।

অবয়ববাদী আলোচনারীতি অনেকাংশে স্যোসুর দ্বারা প্রাণিত। স্যোসুরের মতোই সমষ্টির ভাষা-ভাবনা (La Lang) আর ব্যক্তির ভাষা-ভাবনার (La Parole) মধ্যে ব্যক্তির ভাষা-ভাবনা ও ব্যবহারকেই অবয়ববাদীরা অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ

তাঁরা দেখেছেন ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের কৌশলই পরবর্তী কালে সমষ্টির ভাষা ব্যবহারও কৌশলকে প্রভাবিত করে। ভাষার অর্থবোধের যে ত্রিমাত্রিক নিয়মের কথা আমরা বলেছি, সেখানেও এই ব্যক্তি বিশেষের ভাষিক কৌশল অধিক প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর-অবয়ববাদে বিশেষত বিনির্মাণবাদে প্রথমেই আক্রমণ করা হল বাক্‌কেন্দ্রিকতা বা 'Logocentrism'-কে। এই অনড় অর্থের শাসন থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে অবয়ববাদ থেকে উত্তর-অবয়ববাদে উত্তরণ। উত্তর-অবয়ববাদীরা জানালেন এই চিহ্নায়ক ও চিহ্নিতের মধ্যে যে আধিভৌতিক (Metaphysical) লগ্নতা, যা কিনা আমাদেরই নির্মিত, তা কার্যক্ষেত্রে একটা দ্বিবাচনিক বিপ্রতীপ (Binary Opposition) অর্থবোধের মধ্যে আমাদের বেঁধে রাখে।

জাক দেরিদা যে ডিকন্সট্রাকশনের কথা বলেছিলেন তার সঠিক বাংলা পরিভাষা কী হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। বিনির্মাণ, অবিনির্মাণ, ভাঙ্গন প্রভৃতি অনেকগুলি পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিগত দিনগুলিতে এবিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করে বুঝেছি পাশ্চাত্যে দেরিদাপন্থী সমালোচক এবং দেরিদা স্বয়ং খুব স্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চেয়েছেন, 'ডিকন্সট্রাকশন' বলতে আসলে তাঁরা কী বোঝাতে চাইছেন। তাঁদের মতে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য, এতাবৎ কালের সাহিত্য-শিল্পকে দেখার, পর্যালোচনা করার, সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে একটা মধ্যযুগীয় রীতি অনুসৃত হয়ে চলেছে। সেখানে অর্থের বোধ, শব্দ চয়ন, শৈলী নির্ধারণ সবক্ষেত্রেই বিষয়ীর মধ্যে একটা দ্বিবাচনিক বিপ্রতীপ পক্ষপাতিত্ব কাজ করেছে। যেমন ভালো ও খারাপ, আলো ও অন্ধকার, সাদা ও কালো, পাপ ও পুণ্য, আশিস ও অভিশাপ এইরকম। দেরিদা একেই 'Binary Opposition' বলেছেন। এদের মধ্যে যে অনতিক্রম্য একটা সীমারেখা এতদিন বজায় থেকেছে, আর তার সৌজন্যেই পাঠের একটা অনড় অর্থের তল নির্মিত হয়েছে এবং শাসন চলেছে পাঠক-উপভোক্তার উপরে। পাঠক তাকে প্রশ্ন করার ছাড়পত্র পায়নি। একটা বাক্‌কেন্দ্রিকতা একেবারে জল-অচল রাজত্ব বিস্তার করে রেখেছে পাঠের উপরে। পাঠকের উপরেও। দেরিদা একেই প্রশ্ন-সংশয়িত করতে চেয়েছেন। দ্বিবাচনিক বিপ্রতীপতার মধ্যবর্তী সীমা-নির্দেশক প্রাচীর ভাঙতে চেয়েছেন তাকে প্রশ্নদীর্ণ করে। তুলে আনতে চেয়েছেন 'Irreconcilable contradictory meaning' বা সাযুজ্য-সম্ভাবনাহীন বিপরীত অর্থের সম্ভাবনা। বাক্‌কেন্দ্রিকতার আধিভৌতিক শাসন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন পাঠ-কে। একে তো 'পুনর্নির্মাণ' বলা চলে না। কারণ পাঠের মধ্যে 'পুনর্নির্মাণ' যদি আর একটা পাঠের সম্ভাবনা নির্মাণ করে, তবে তা হয় সামগ্রিক স্তরে। পাশ্চাত্য সমালোচকের পরিভাষায় যাকে বলা হয়

'Macro Level'। সেখানে ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি থেকে ভাষা ও ভাব যেখানে সমাপতিত হয়, সেই শৈলীর প্রতিটা আনুপুঙ্খ পর্যালোচিত হয় না। দেরিদা পাঠের ক্ষেত্রে পাঠকের ক্ষুদ্রতর বিচারক্ষেত্র, যাকে তিনি 'Micro level reading' বলেছেন, তাকেই প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছে। এটিই 'বিনির্মাণ'। কোনো তত্ত্ব নয়, একটা পাঠরীতি হল এই 'বিনির্মাণ', যার পথে বিছানো থাকে অহরহ প্রশ্ন আর সংশয়। সেটিই পাঠ-কে নিয়ে চলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের কাছাকাছি। আবার এই পদ্ধতিতেই পরক্ষণেই ভেঙে পড়ে পূর্ববর্তী অর্থের সংসার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গলের কবি : কাহিনির বিনির্মাণ

ভারতবর্ষের, বিশেষত দাক্ষিণাত্য, উত্তর বিহার, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে নানা কবির মনসামঙ্গলের পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটা কাহিনিগত যোগসূত্র থাকলেও পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো। কাহিনি, চরিত্র, পুরাণপ্রসঙ্গের সংযোজন-বিয়োজন, অন্যান্য স্থানীয় প্রচলিত কাহিনির সমাপতন সেগুলিকে বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে একে অন্যের থেকে। তবে আলোচনার বিস্তারের কথা মাথায় রেখে আমরা কবি ধরে আলোচনার ক্ষেত্রে অবিভক্ত বঙ্গদেশের মধ্যেই আমাদের আলোচনার পরিসর সীমাবদ্ধ রাখব। কবির সৃজনের আলোচনায় আমরা জারি রাখব বিনির্মাণবাদী পাঠরীতি। প্রথমে আমরা মনসামঙ্গলের পরিচিত কাহিনিগুলি আলোচনা করে নিতে চাই। পরিকল্পনা মতোই বর্তমান পরিচ্ছেদ কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকবে।

উত্তর বিহারে প্রচলিত মনসামঙ্গল

সোনাদহে স্নানকালে শিবের জটায় পাঁচটি পদ্মের জন্ম হয়। সেই পাঁচটি পদ্মফুল থেকে কালক্রমে একচক্ষু অন্ধ মনসা ও তাঁর চার কুমারী বোনের আবির্ভাব হল। আবির্ভাবকালেই মনসার সঙ্গে শিবজায়া গৌরীর খণ্ডযুদ্ধ দেখা দিল। মনসার দংশনে গৌরী অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। মনসা শর্ত দিলেন শিব যদি সম্মত হন পুজো প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিব-শিষ্য চাঁদ সদাগরকে উৎপীড়ণ করতে পারেন তবে গৌরীর প্রাণ ফেরাবেন। শিব সম্মত হলেন। মনসার উৎপীড়ণের নানা কাহিনি শেষে চাঁদের পুজো পেলেন মনসা। [১৫]

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মনসামঙ্গল

দাক্ষিণাত্যে মনসার স্থলে রয়েছেন অম্ববরু নামের ইচ্ছাধারী এক লৌকিক দেবী। সেখানে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তাঁরই ডিম থেকে জন্ম নিয়েছেন। দেবী তাঁদের বলে দিলেন, তাঁরা যেন অম্ববরু ছাড়া আর কারো পুজো না করেন। তারা অমান্য করলেন। নানা ঘটনাধারায় তারা শেষে পর্যুদস্ত হয়ে দেবী অম্ববরুর সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য হন ও দেবীর পুজো করেন।[১৬]

বঙ্গদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গল

চম্পকদেশের বণিক চন্দ্রধর পরমশৈব। মানব রুপে জন্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন স্বর্গের শিবপূজারি। শিবপুজোর ফুল সংগ্রহ করতে তিনি একদিন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সাপের আবরণ ও অলঙ্কারে আবৃতা দেবী মনসা সেই অরণ্যে ছিলেন। চাঁদের সাড়া পেয়ে সাপরা স্থান ত্যাগ করলে দেবী চাঁদের সামনে নিরাবরণা হয়ে গেলেন। লজ্জিতা দেবী চাঁদকে অভিশাপ দিলেন মর্ত্যে মানবজন্ম গ্রহণের। চাঁদও জানালেন, যদি এই পরিস্থিতির জন্য চাঁদের কোনো দোষ না থাকে তবে দেবীও চাঁদের ইচ্ছে ভিন্ন মর্ত্যে পুজো পাবেন না। বিজয় সদাগরের গৃহে চাঁদ জন্মগ্রহণ করলেন। মনসা চাঁদকে পুজো প্রার্থনা করলেন। প্রত্যুত্তরে চাঁদ হেঁতালের লাঠি দিয়ে মেরে মনসার কাঁকালি ভেঙে দিলেন। মনসার প্রকোপে চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেল। কৌশলে হরণ করলেন চাঁদের অর্জিত ‘মহাজ্ঞান’। পুত্র লখিন্দরের বিবাহের আয়োজন করতে শুরু করলেন চাঁদ। সর্প-দংশনে মৃত্যু হল লখিন্দরের। কলার মান্দাসে বেহুলা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্গত হলেন গাঙুরের পথে। নৃত্য-গীতে শিব সহ তেত্রিশকোটি দেবতা কে তুষ্ট করলেন বেহুলা। বেহুলার ইচ্ছে মতো শিব মনসাকে আদেশ দিলেন লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য। মনসা লখিন্দর সহও তার অন্য ভাইদেরও প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন চাঁদ মনসা পুজো করলে তবেই লখিন্দরের প্রাণ ধারণ নিশ্চিত হবে। সপ্তডিঙা মধুকরে ছয় দেবর সহ লখিন্দরকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন বেহুলা। তার অনুরোধে নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রেখে পিছন ফিরে বাম হাতে ফুল ফেলে চাঁদ মনসা পুজো করলেন। মনসার পুজো মর্ত্যে প্রচারিত হল।[১৭]

উপরের কাহিনিগুলো পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারছি বঙ্গদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনিটি বেশি দীর্ঘ ও বহুকৌণিক। অনেক সমকালীন ও পুরাণাশ্রিত

কাহিনি এর মধ্যে সমাপতিত হয়ে কাহিনিটিকে জটিলতা দিয়েছে। শঙ্কর গারুড়ী বা নেত্রবতীর কাহিনি বা জালু-মালু বা গোদার কাহিনি হয়ত সমকালে প্রচলিত ভিন্ন কাহিনি। কারণ মূল কাহিনিতে এদের সন্নিবেশ না করলেও কাহিনির গতিতে খুব একটা ক্ষতি হত না। মূল কাহিনির সঙ্গে এই কাহিনিগুলোর এমন কিছু যোগ নেই। অবশ্য বিহারী কাহিনিতেও একজন নেতুলার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তুলনায় বিহারী ও দক্ষিণের কাহিনি অনেক সরল। আমাদের মনে হয় মূল কাহিনিটি এই রকম সরলই ছিল। বঙ্গকবিরা আপন কল্পনায় তাকে জটিল ও বহুকৌণিক করেছেন। তবে বঙ্গদেশের কবিদের রচনায় বিহারী ও দাক্ষিণাত্যের এই লৌকিক দেবীর কাহিনি নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই পরিচ্ছেদেই আমরা মূলত বাংলাভাষায় লিখিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলি প্রধান প্রধান কবির সৃজনের মধ্যে আলোকপাত করে শব্দবন্ধ ও বাক্য ধরে ধরে বিনির্মাণবাদী পাঠ করেছি। বিনির্মাণবাদকে এক্ষেত্রে দর্শন হিসেবে নয়, পাঠের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি। কবি কেন্দ্রিক আলোচনায় আমরা নিয়েছি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল এবং পূর্ববঙ্গের কবি জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আধুনিক বাংলা নাটক

আধুনিক বাংলা নাটকে মনসামঙ্গলের কাহিনি, চরিত্রদের নতুন ভাবে পড়ার চেষ্টা করেছেন কোনো কোনো নাটককার। তাঁদের দেখার কৌণিক বদলে নির্মিত হয়েছে মনসামঙ্গলের নতুন ব্যাখ্যা। বর্তমান অধ্যায়ে সেইরকম তিনটি পরিচ্ছেদে নাটকের টেক্সট বেছে নিয়ে নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে বিনির্মানের যাথার্থ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাটকে বিনির্মিত অন্ধকার : মনসার জন্ম, মনসার অস্তিত্ব

মনসামঙ্গলে পদ্ম-নাল বাহিত হয়ে মহেশ্বর-বীর্যের পাতালের আঁধারে প্রবেশের মধ্য দিয়ে মনসার জন্ম; মানুষের গোপন কাম, হিংসা, লোভের গর্ভে প্রতিনিয়ত মনসার জন্ম

হয়ে চলেছে। সে কোনো শরীর নয়। শুধু অনুভববেদ্য অস্তিত্ব। সেই মিথই বিনির্মিত হয়েছে বাংলা নাটকে। সেই দিক থেকে শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা'[১৮] নাটকটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক। অনেক সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকের পরেই শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটকের তালিকায় এই নাটকটিকের স্থান দিয়ে থাকেন। তার মূল কারণটিই হল নাটককার মনসামঙ্গলের কাহিনিকে সমসাময়িক কালে প্রতিফলিত করতে গিয়ে তার মিথের মোড়ক সম্পূর্ণ উৎপাটিত করে নিজস্ব ঢঙে নাটক নির্মাণ করেছেন। একবারের জন্যও মনসাকে সশরীরে উপস্থিত করাননি। অথচ এই নাটকের সঙ্গে লেপ্টে থাকা আঁধারের সমার্থক হয়ে উঠেছেন মনসা। বর্তমান পরিচ্ছেদে বিনির্মাণবাদকে আশ্রয় করে নাটকটির নিবিড় পাঠের মাধ্যমে আমরা মনসার জন্মরহস্য আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি বেহুলা ও সনকার জীবনে সম্যক যে দুজন পুরুষ উপস্থিত,অর্থাৎ চাঁদ বণিক ও লখিন্দরের সঙ্গে নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের বাইরে অন্ধকার দিকের ভাঙচুরের অপ্রকাশিত কাহিনি। পাশাপাশি অন্যান্য নাটকেও মনসার কাব্যকথিত জন্মরহস্য আর অস্তিত্বের আঁধার তুলনীয় আলোচনায় এসেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনসা কথা : নাটকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিনির্মাণ

শুধু মনসার মাহাত্মকীর্তনেই শেষ হয়নি মনসামঙ্গল কাব্য। সেখানে এক অকথিত রাজনৈতিক বয়ানও উপস্থিত। শেখর দেবরায় যে 'মনসা কথা'[১৯] নাটকটি লিখেছেন, সেখানে মূল বিষয়টিই হল মনসামঙ্গলের কাহিনির মধ্যে না বলা রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ। দলিত রাজনীতি বনাম উচ্চবর্ণের রাজনীতি। চাঁদ উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। তিনি জানেন মনসা তাঁকে মারবেন না। কারণ মারলেই খেলা শেষ। মনসাও জানেন চাঁদের মৃত্যুতে তাঁর ক্ষতিই বেশি। একেবারে মেরে ফেলাতে তাই তাঁরও আগ্রহ নেই। মনসা যেন সেখানে দলিত নেত্রী। কিন্তু তা বলে তিনি দলিতদের জন্য লড়ছেন এমনটা নয়। তিনি লড়ছেন নিজের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য। চাঁদ আর মনসা যেন রাজনৈতিক মিথোজীবিতার নামান্তর হয়ে উঠেছেন। ভারতবর্ষীয় রাজনীতি এই দিকটা মনসামঙ্গলে কেমন সুপ্ত ছিল, তা শেখর দেবরায় সহ অনেকের নাটকনির্মাণের নিবিড়পাঠ থেকে আমরা উদ্ধার করেছি। এই পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি মনসামঙ্গলের রাজনৈতিক বিনির্মাণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্প ও আদর্শের নতুন 'পালা' : নাটকে বিনির্মিত দ্বান্দ্বিক দর্পণ

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' থেকে অজিতেষ বন্দ্যপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা'[২০] নাটকে সরাসরি মনসামঙ্গলের কাহিনি নেই। তবু 'পালা'র ঢঙে মনসা কাহিনির বিনির্মাণ ঘটেছে। শম্ভু মিত্রের চাঁদ থেকে অজিতেষের নাটকে পালাকার প্রসন্ন, সতী, কালোর মধ্যে অঙ্গাঙ্গি জরিয়ে আছে মনসামঙ্গলের চরিত্ররা। প্রসন্ন গ্রামে গ্রামে মনসামঙ্গলের পালা গাইতে গাইতে কখন যেন চাঁদের মতো হয়ে গেছে। ছোট চৌকাঠের দরজায় মাথা নিচু করতে তার আপত্তি। শিল্পী সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে তার অশান্তির শেষ নেই। তবু সে হারতে রাজি নয়। সহায় সম্বল হারাতে হারাতে পরিবর্তিত সময়ে সবার দোষের ভাগিদার হয়েও প্রসন্ন হারতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের আলো মেখেও কালের বিনির্মিত নাট্যপ্রয়াসে সে উজ্জ্বল। 'পালা' আসলে তো কাহিনি। সেটা নিয়ম মতো সবসময় অতীতচারণ হবে কেন? 'পালা'-র বিষয়গত বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন নাটককার। সেটি হয়ে উঠেছে পালাকারের আত্মপরিচায়ক। নিজের মুখে নিজেরই কাহিনি বলে চলা। মনসাপালা আর পৌরানিক বিনোদন নয়, শিল্পীর সংগ্রামী জীবন থেকে উঠে আসা বায়োগ্রাফি।

তৃতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য

কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণের নানা অনুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে'[২১], অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে'[২২]; ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিমল করের 'বেহুলা'[২৩], সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা'[২৪] প্রভৃতিতে বিনির্মাণের সম্যক লক্ষ্মণ ফুটে ওঠে। বাংলা কথাসাহিত্যে বিনির্মাণের বহুকৌণিকতা বর্তমান অধ্যায়ে উপন্যাস ও ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে মনসা মঙ্গল : বিনির্মিত স্বর্গ থেকে পাতাল

মনসামঙ্গল মনসার স্বর্গে প্রতিষ্ঠার কাহিনি। পুজো প্রাপ্তির কাহিনি। সেই স্বর্গ কে দেখেছে? কে দেখেছে মনসার পাতালপুরী? সবই তো কবির চোখে দেখা!

ঔপন্যাসিকের কলমে তার বিনির্মাণ ঘটেছে বারবার। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'মনসা মঙ্গল'[২৫] নামে যে নাতিদীর্ঘ উপন্যাসটি লিখেছেন সেখানে সরাসরি কোনো মনসামঙ্গলের কাহিনি আসেনি। এসেছে মোটিফ আকারে। উপন্যাসের মনসাবালা যেন মনসারই মতো মানসলোকে পোষণ করে চলে ভালো খাওয়া, ভালো পরার স্বর্গীয় স্বপ্ন। মনসার স্বামী শ্রীপতি তো শিবেরই নাম। শিবের মতোই উপন্যাসে চাল-চুলোহীন অথচ ঐশ্বর্যবান পুরুষ। মনসামঙ্গলের কাহিনি বিশ্লেষণ করলেও দেখি মনসাকে শিব কামনাই করেছিলেন। কিন্তু সমাজের সম্পর্কগত নিষেধের কারণে পারেননি। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে আবার নিরঞ্জন সেটাও করেছিলেন। এবং সেটা করেছিলেন পুত্র শিবের সম্মতিতে। এই উপন্যাসে শ্রীপতি মনসাকে চাইলেও মনসার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কছে সেই চাওয়া ফিকে হয়ে যাচ্ছিল বারবার। প্রদীপের নিচে জমাট অন্ধকারের মতো উপন্যাসে রয়েছে স্বর্গসুখ তথা একটা শহুরে দু'তলা বাড়ি। দু'তলা বাড়ির ওপরের তলায় থাকেন মালিক পক্ষ। অর্থাৎ দেবতা তাঁরা। মনসাবালা কিছুতেই নীচে নামতে চায় না। চাকরানী হলেও তার দ্বিতলটিই পছন্দের। শ্রীপতিকেও ওপরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই মনসার। চায়ও না সে। ক্রমে নিজের অতীত থেকে শিকড় বিচ্ছিন্ন করতে চায় সে। মনসামঙ্গলে মনসার সে উদ্বর্তন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিক সেটা হতে দিলেন না। এক্ষেত্রে কিছুটা অর্থডক্স তিনি। ছিন্নমূল অপছন্দের তাঁর। তাই মনসাকে ফিরতে হল নিজের অতীত প্রান্তিক জীবনে। অবশ্য সানন্দে। স্বর্গের ধারণা মনসামঙ্গলের কাল থেকে একালে বিবর্তিত হয়েছে। নারী পুরুষের সম্পর্কের বুনট বদলেছে। সেই বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতেই মনসামঙ্গল বিনির্মিত হয়েছে শীর্ষেন্দুর 'মনসা মঙ্গল'-এ। অধ্যায়টিতে তুলনীয় আলোচনায় এসেছে 'চাঁদবেনে'র মতো আরও কয়েকটি উপন্যাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে বিনির্মিত বেহুলা : 'আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'

নারীর কোনো দেশ হয় না। নারীর কোনো ধর্ম হয় না। নারীর কোনো বাড়ি হয় না। মনসামঙ্গলে লখিন্দরের মৃত্যুর পরে শ্বশুরবাড়ি সহ সমস্ত সমাজের দৃষ্টি ছিল বেহুলার প্রতি। সে দৃষ্টির নানা রকমফের ছিল। রাগ, কামনা, করুণা এই সবের কেন্দ্রে এসে দাঁড়াতে হয় বেহুলাকে। সহমরণের নিদান তো সমাজ সম্ভবত দিয়ে থাকে স্বামী-বিবিক্ত একজন নারীর সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করতে না পেরে। ঠিক করতে না পেরে

তাকে কার হাতে ছাড়বে! বালক যেমন খেলায় হেরে খেলাটাকেই ভণ্ডুল করে দেয়, এও অনেকটা তেমন। একজন স্বামীহারা নারীর প্রতি সমাজের নানা জনের তো নানারকম চাহিদা। কেউ চায় স্বামীর স্থান পূরণ করতে। তাকে বিবাহ করতে, আশ্রয় দিতে। এতে হয় পুরুষটির অন্তরের মহান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে, নয় ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হবে। কেউ চায় শুধুই নারীটির যোনির দখল। কেউ চায় নিজের ধর্ষকাম অথবা মর্ষকাম মিটিয়ে নিতে। বেহুলাকে এর মধ্যে দাঁড়াতে হয়েছিল। এসব কথা অকথিত ছিল মনসামঙ্গলে। বিনির্মিত চেতনায় একালের কথাসাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী 'চাঁদ-মনসার জোট'[২৬] উপন্যাসে দেখিয়েছেন পল্লবী বলে এক নারীর বিবাহ পরবর্তী জীবন-সংগ্রাম। পল্লবী সহ আজকের নারীকে একালেও দাঁড়াতে হয় বেহুলার সমান পংক্তিতে। সেখানে সামূহিক নির্জ্ঞানে চাঁদ ও মনসা জোটবদ্ধ। সবাই বেহুলা অথবা পল্লবীর বিপক্ষ। উপন্যাসটিতে মনসামঙ্গলের কাহিনি বলা হয়নি। লেখক বেহুলাকেই পল্লবীর মধ্যে ভাঙলেন অহরহ। বাংলা কথাসাহিত্যে তুলনীয় আরও নিদর্শন পঠিত হয়েছে বর্তমান পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহনশীলতা থেকে প্রতিবাদে বিনির্মিত নারী : ছোটগল্পে 'বেহুলা'

মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর ও মনসার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই চলছিল। একজনের অস্ত্র প্রকোপ, অন্য জনের অস্ত্র ছিল প্রতিস্পর্ধা। এর মধ্যে পড়ে সনকা সাত ছেলে হারাল। চম্পকনগরে বিপুল মানবসম্পদ সাপের কামড়ে মারা গেল। ধন্বন্তরী বা শঙ্কর গারুড়ী সাপের কামড়ে মারা গেল। সপ্তডিঙা মধুকরের মাঝি-মল্লা, নাবিক, লোক-লস্কর মারা গেল। অথচ কেউ কিছু বলল না! সেই অর্থে সমাজের কোনো কণ্ঠস্বর নেই! মায়ের কোনো প্রতিবাদ নেই। নারীর কোনো কণ্ঠস্বর নেই। মনসাও পুরুষসম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেটাই কি চিরন্তন! সেটাই কি স্বাভাবিক! আসলে সলতে প্রস্তুত ছিল। অভাব ছিল আগুনের। মহাশ্বেতা দেবী 'বেহুলা'[২৭] গল্পে কালাজ সাপ বিধ্বস্ত বাহুলা গ্রামে আনলেন সেই আগুনের পরশমণিস্বরূপ বসন্তকে। 'বেহুলা' এই গল্পে সর্পদষ্ট গ্রাম। বেহুলা এই গল্পে সাপে কাটা মৃতদেহ বহনকারী নদী। 'কালাজ' সেকালের 'কালনাগিনী'। জনতার সর্পনিধন গল্পকার মহাশ্বেতার বিনির্মিত আবিষ্কার। চাঁদ বণিক একালে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন জনতার মাঝে। নিলেন সেকালের অসমাপ্ত যুদ্ধের প্রতিশোধ। বিমল করের 'বেহুলা' বা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা' গল্পেও বিনির্মিত হল

নদী আর নারীর সহনশীলতা আর প্রতিবাদের মঙ্গলকাব্যে অকথিত বেহুলার প্রতিবাদের কণ্ঠ। এই পরিচ্ছেদের মূল অনুধ্যান সেখানেই।

চতুর্থ অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আধুনিক বাংলা কবিতা

জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা'[২৮], বিষ্ণু দে-র 'এবং লখিন্দর'[২৯], সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বেহুলা'[৩০], অরুণ মিত্রের 'ও বেহুলা'[৩১], বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লখিন্দর'[৩২] (কাব্য) ও 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ'[৩৩] (কবিতা), জিয়া হালদারের 'লখিন্দর'[৩৪], দীপঙ্কর মাহমুদের 'বেহুলার ভেলা'[৩৫], শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'মনসা-মঙ্গল'[৩৬] প্রভৃতি সৃজনে মনসা মঙ্গলের বিনির্মাণ ঘটেছে। সুসংহতি বজায় রাখার জন্য এই অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে বাংলা কবিতায় মনসামঙ্গলের বিনির্মাণগত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেহুলার শাড়ি : আব্রুর নতুন সংজ্ঞা

মনসামঙ্গলে বেহুলাকে বেআব্রু করার নানা চক্রান্ত নানা সময়ে হয়েছে। নিহত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গপথে যাত্রা সুগম ছিল না বেহুলার। স্বর্গও সুরক্ষা দেয়নি বেহুলার আব্রুকে। জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা' কাব্য থেকে মুহম্মদ নূরুল হুদার 'বেহুলার শাড়ি'[৩৭] কাব্যগ্রন্থের কবিতা, একালের নানা প্রেক্ষিতে বেহুলার আব্রু হননের বিনির্মিত বয়ান। 'বেহুলার শাড়ি' বইটির প্রতিটি কবিতাই অন্য স্বরের। যেমন 'বয়ে যায় দুই কূল' কবিতায় 'সতী' শব্দটাই হয়ে উঠেছে একটা পুরুষালী অভিপ্রায়ের সমার্থক। সতীত্ব রক্ষা আসলে নারীর নয়, পুরুষের নিজস্ব প্রয়োজন। এছাড়া তার ঈশ্বর-প্রমাণ হওয়ার আর অন্য কোনো পথ নেই। সতীত্ব আসলে পুরুষের নারীদেহের একক ঈশ্বর হওয়ার উপায়। ফলে প্রশ্নটা আর নারী বিশুদ্ধতার থাকছে না। হয়ে উঠছে পুরুষের বিশুদ্ধ একেশ্বর হওয়া। সেখান থেকেই যুদ্ধ, গোলা-বারুদ, সংযোগহীনতার পরিখা খনন। আবার 'জরিপ' কবিতায় 'ধর, শুধু দেহটাকে ধর' উচ্চারণ করলে যেন সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যটা এক নিশ্বাসে বলা হয়ে যায়। নারী শরীর আর আব্রুর এই বিনির্মাণ একালের বাংলা কবিতায়। বর্তমান পরিচ্ছেদে বিনির্মাণবাদকে সামনে রেখে সেই কবিতাগুলির বিষয়কেন্দ্রিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষমতার বিপক্ষে লড়াই ও স্বাধীনতার নির্ঘোষ : কবিতায় মনসামঙ্গল

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লখিন্দর' থেকে শঙ্খ ঘোষের 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'(১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'হেতালের লাঠি'[৩৮]। ক্ষমতার বিপক্ষে লড়াই বারবার ফিরে এসেছে মনসামঙ্গলের কাহিনির ভিতর থেকে। মসনার বিপক্ষে চাঁদ সদাগরের লড়াই মনসামঙ্গলে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই আধুনিক কবি শুরু করেছেন অকথিত ও সমাপ্তিবিহীন স্বাধীনতার লড়াইটাকে ভাষা দিতে। 'হেঁতালের লাঠি' কবিতায় কুণ্ডলিত বা গুটিপাকানো বিষাক্ত সাপ প্রেম বিনষ্টির সংকেতবাহী। অপরপক্ষে হেতালের লাঠি যেন সেই প্রেমের আর নবজীবনের রক্ষক। চাঁদের সাপ নিধনের অন্যতম ভরসা ছিল হেতালের লাঠি। যুগান্তরে সেই লাঠিই হয়ে গেছে যেকোনো মৃত্যুমুখী চক্রান্তের বিপক্ষতার শক্ত-পোক্ত হাতিয়ার। লাঠির বিনির্মাণ ঘটেছে কবিতায়। শুধু এই কবিতায় নয়। আরও অনেক বাংলা কবিতায় মনসামঙ্গলের না বলা আন্দোলন ভাষা পেয়েছে। বিনির্মাণের আলোয় সে সব কিছুই বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অজৈবের জৈব স্বপ্নবিলাস : কবিতায় সপ্তডিঙ্গা মধুকর ও অন্যান্য

বিনির্মাণবাদী পাঠ-প্রক্রিয়া যেহেতু কোনো শব্দের যতরকম অর্থগত সম্ভাবনা থাকে তার সবগুলি মুক্ত করাকে উৎসাহিত করে, সেহেতু মনসামঙ্গলে সপ্তডিঙা মধুকর থেকে অন্যান্য অজৈব বস্তুর প্রসঙ্গও বিনির্মিত হয়েছে বাংলা কবিতা অনেক নির্মাণে। প্রসঙ্গত সপ্তডিঙা মধুকরকে নিয়ে লেখা কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতা 'চাঁদ বণিকের ডিঙা'[৩৯] এক্ষেত্রে পৃথক অনুধ্যানের দাবি রাখে। সপ্তডিঙা মধুকর তো সমৃদ্ধির স্মারক। তার নিমজ্জন সেদিক থেকে সমৃদ্ধির নিমজ্জনও। তার প্রত্যাশায় সবাই বসে থাকে। কিন্তু নিমজ্জিত অবস্থায় ডিঙার নিজের কী মনে হতে পারে সে সম্বন্ধে মনসামঙ্গল নিরুত্তর। এখানেই কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতা কথা বলে ওঠে। অজৈব মধুকর ডিঙার স্বপ্নচারণা মনসামঙ্গলের কালে পৌঁছে বিনির্মিত হয়। সঙ্গে মেশে একালের চেতনালগ্নতা। শুধু মধুকর ডিঙাই নয়, বেহুলার শাড়ি, হেঁতালের লাঠিসহ নানা অজৈব বস্তু পৃথক

অর্থবোধে বিনির্মিত হয়েছে বাংলা কবিতায়। বর্তমান পরিচ্ছেদে সেগুলির সম্যক আলোচনা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : চলচ্চিত্র ও অন্যান্য সংরূপ

গবেষণা প্রস্তাবনা লিখনকালে আমরা ঠিক করেছিলাম প্রবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্য, সিনেমা, চিত্র প্রভৃতি সংরূপের মধ্যে মনসামঙ্গলের বিনির্মিত সম্ভাবনা উন্মোচিত করব। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই একমাত্র চলচ্চিত্র ছাড়া সেইভাবে উল্লেখিত সংরূপগুলিতে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ হয়নি। পটুয়াদের চিত্র, বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা পর্যবেক্ষণ করে আমরা বুঝেছি মনসামঙ্গলের পরিচিত কাহিনির ধরা-বাঁধা পথেই সেগুলি এগিয়েছে। বরং চলচ্চিত্রে দর্শক চাহিদা ও বক্সঅফিসের তাড়নায় অনেকখানি বদলে গেছে মনসামঙ্গল। মূলত উপাদানের অপ্রতুলতার জন্যই আমরা বর্তমান অধ্যায়টিকে চলচ্চিত্রকেন্দ্রিকআলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি। আর চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণকে এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় সেখানে সাপের ভয়ই সাপের জয়। মনসার অনিষ্টকারী সত্তা রক্ষক অথবা কর্মফলের নিয়ামক হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রে।

স্বাধীনতার আগে-পরে এপার আর ওপার বাংলায় প্রচুর সাপ ও মনসা কাহিনি নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে। সত্যি বলতে কি, বাংলা ভাষায় এই ধরণের ছবি বেশি বেশি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশেই। তার কারণগুলো আমরা গবেষণা সন্ধর্ভে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা কালানুক্রমিক কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক চলচিত্রের উল্লেখ করলাম। 'মহুয়া' (১৯৬৬), 'বেহুলা' (১৯৬৬), 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' (১৯৬৮), 'পাতালপুরীর রাজকন্যা' (১৯৬৯), 'মলুয়া' (১৯৬৯), 'আমীর সওদাগর' (১৯৭০), 'ভেলুয়া সুন্দরী' (১৯৭০), 'নাগ নাগিনী' (১৯৭৯), 'শীষ নাগ' (১৯৭৯), 'নাগিনী কন্যা' (১৯৮২), 'নাগ পূর্ণিমা' (১৯৮৩), 'নাগ রানী' (১৯৮৩), 'পদ্মাবতী' (১৯৮৪), 'রসের বাইদানী' (১৯৮৪), 'চন্দনদ্বীপের রাজকন্যা' (১৯৮৪), 'জিপসি সর্দার' (১৯৮৪), 'সতী নাগকন্যা' (১৯৮৫), 'নাগমহল' (১৯৮৬), 'চাঁদ সদাগর' (১৯৮৬), 'মহুয়া সুন্দরী' (১৯৮৭), 'নাগজ্যোতি' (১৯৮৮), 'সর্পরানী' (১৯৮৮), 'বেহুলা লখিন্দর' (১৯৮৮), 'জলপরী' (১৯৮৯), 'বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৮৯), 'সাপুড়ে মেয়ে' (১৯৮৯), 'সাগরকন্যা' (১৯৮৯), 'নাচে নাগিন' (১৯৯১), 'শীশমহল' (১৯৯১), 'বনবাসে বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৯১), 'রূপসী নাগিন' (১৯৯২), 'নাগিনী সাপিনী' (১৯৯২), 'নাগ

নাগিনীর স্বপ্ন' (২০০৯)। এই ধারা আজও চলমান। তবে সাত, আট বা নয়ের দশকে যত এইধরনের ছবি তৈরি হয়েছে এখন ততটা হয় না। তারও কারণ আমরা সন্ধান করেছি। আমরা আলোচনা করেছি সাপের দৃষ্টি, সাপের মণি, সাপের লেজ খসা ইত্যাদি বিষয়গুলিও কীভাবে বাংলা ছবিতে বিনির্মিত হয়েছে। এই সংরূপের মধ্যে বিনির্মাণ আলোচনার জন্য আমরা কতকগুলি বাংলা ছবি বেছে নিয়েছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ একটা গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। আসলে বিনির্মাণ যে পাঠের নিয়ত ভাঙ্গা-গড়ার প্রক্রিয়াগত অনুশীলনের কথা বলে, তাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে প্রামাণিকতা দিতে হলে একটা সুবিশাল সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সুবিস্তৃত সময়ব্যাপী অনুশীলনের দিকে তাকাতে হত। মনসামঙ্গল কাব্য সে দিক থেকে বিশেষ উপযোগী।

দেরিদার 'Of Grammatology' গ্রন্থের অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক পূর্বোক্ত 'Translator's Preface' –এ সুবেদী যে মন্তব্যটি করেছেন তা হল:

> "If in the process of deciphering a text in the traditional way we come across a word that seems to harbor an unresolvable contradiction, and by virtue of being one word is made sometimes to work in one way and sometimes in another and thus is made to point away from the absence of a unified meaning, we shall catch at that word. If a metaphor seems to suppress its implications, we shall catch at that metaphor. We shall follow its adventures through the text and see the text coming undone as a structure of concealment, revealing its self-transgression, its undecidability."[৪০]

একটা সিদ্ধান্তে এসে নোঙর করে স্থির হয়ে থাকার যাবতীয় আয়োজনকে অস্বীকার করে দেরিদার বিনির্মাণ। এমন কি তত্ত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টাকেও এই প্রক্রিয়া মেটাফিজিক্যাল অনুশীলন বলে মনে করে। এই চলিষ্ণুতাই সেই প্রাগাধুনিক কাল থেকে মঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখাটির পাঠ পরিবর্তন সম্ভবপর করে এসেছে।

মহাভারতের কালের আগে কোনো সর্পদেবীর উল্লেখ ভারতীয় শাস্ত্রে বা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। মহাভারতে প্রথম সর্পদেবতা বাসুকির ভগ্নি হিসেবে জরৎকারুর (দ্রষ্টব্য ইনি মহিলা এবং মনসার দৈবী মহিমা প্রচারকালে ইনি পুরুষ এবং মনসার স্বামী হিসেবে পরিচিত হলেন যা বিনির্মাণেরই দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যায়) নাম মেলে। কিন্তু তাঁর উপর কোনো দৈবী মহিমা আরোপিত হয়নি। তিনি কেবলই আস্তিকের মাতা। পরে মনসার ধ্যান মন্ত্রে মনসা হয়ে উঠলেন আস্তিকের মাতা। অর্থাৎ প্রাথমিক কাল থেকেই ভাঙ্গা-গড়ার পথে এগিয়েছেন মনসা তথা তাঁকে নিয়ে লেখা কাব্য।

শঙ্কর গারুড়ী-নেতার মনসাকাহিনি বিলয় প্রাপ্ত হয়েছে। নেতা বা নেত্রবতীর ছাঁচ বদলেছে সেই প্রাগাধুনিক কালেই। চাঁদ সদাগর-মনসাও বিনির্মিত হচ্ছেন তখন থেকেই। ঐতিহ্যের মধ্যেই আধুনিক সৃজনশীল মনন খুঁজে নিয়েছে নিজস্বতা বিকাশের রসদ। কবিতা, কথাসাহিত্য, নাটক বা অন্যান্য সংরূপে মিলেছে তার নিদর্শন। সে প্রক্রিয়া থেমে থাকার নয়। বর্তমান গবেষণা সেই চলাতেই অভিনিবেশ করতে আগ্রহী।

বর্তমান গবেষণায় আমরা যেমন বিনির্মাণকে দার্শনিক দিক থেকে আলোচনা করেছি, তেমনই আবার বিনির্মাণকে সাহিত্য পাঠের উপকরণ (Tool) হিসেবেও ব্যবহারও করেছি। ফলে আমাদের পাঠপ্রক্রিয়ায় মনসামঙ্গলের পাঠের ভিতরে শব্দের মধ্যে মধ্যে যে অনুচ্চারিত অর্থের দ্যোতনা সুপ্ত ছিল, তা উন্মোচিত হয়েছে। বিনির্মাণের তাৎপর্যও সেখানেই। দেরিদার মতামত যে কোনো নৈরাজ্যের অন্ধগলিতে পাঠকে নির্বাসিত করে তাকে শেষ করে দেয় না, বরং নতুন নতুন অর্থের সম্বাবনা তৈরি করে তার ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির স্তরে পাঠককে নিয়ে নিরন্তর অভিযান করায়, বর্তমান গবেষণায় আমরা সেই লব্ধতথ্যই তুলে ধরেছি।

তথ্যসূত্র

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ২২৮-২২৯

২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, জানুয়ারি ২০০৩, *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ২৪৪

৩. Derrida, Jacques, 2002, *Of Grammatology*, 'Translator's Preface', Gayatri Chakravorty Spivak (Translated), Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, P. xii

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, জানুয়ারি ২০১৪, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক*, ভুমিকা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃ. ২৯

৫. Sartre, Jean-Paul, 1965, *Situations***,** (English Ed.), New York, George Braziller, ISBN 0807602922 (ISBN 13: 978-0-807-60292-8), P.29-156

৬. Camus, Albert, 1991, *The Plague* (Original: 'La Peste', 1947), UK, Vintage International Series, Penguin, ISBN 0679720219 (ISBN 13: 978-0-679-72021-8)

৭. Levi-Strauss, Claude, 1963, *Structural Anthropology*, Author's Preface to the French Edition, UK, Hachette, British Library Catalog Card Number: 801-95-PN-63-17344, ISBN-13:978-0-465-09516-2

৮. Foucault, Michel, 1988, *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*, New York, Abridged (Paperback Edition), ISBN 13: 978-0-679-72110-9

৯. Hobsbawm, Eric, 8April 2010, *Palmiro Togliatti: A Biography by Aldo Agosti translated by Vanna Derosas* and *Jane Ennis and IL sarto di Ulm: Una possibili storia del PCI by Lucio Margi*, London Review of Books, Vol.32, No.8, ISSN 0260-9592

১০. Foucault, Michel, 1994, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, UK, Vintage Book Series, Penguin, P.13-57, 388-416

১১. Barthes, Roland, 2007, *Critique Et Verite*, UK, The Athlone Press, British Library data: 1.criticism 2.linguistics 3.french literature-history and criticism, Catalogue No. 801-95-PN-98.I.V, ISBN 13: 978-0-826-49474-0

১২. Derrida, Jacques, 1990, *Glas* (Paperback), America West, University of Nebraska Press, ISBN 13: 978-0-803-26581-3, P.52-26

১৩. Reason, Webpage viewed on 24April, 2018, 11.35pm (IST), *Reality Principles: An Interview with John R. Searle*, source link:

http://reason.com/archives/2000/02/01/reality-principles-an-interview/1

১৪. ঘোষ হাজরা, আনন্দ, ২০০৮, *সাহিত্যবিচারে অবয়ববাদ, উত্তরাধুনিকতা ও উপনিবেশবাদ*, কলকাতা, একুশ শতক, পৃ. ১৪-১৬

১৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ২২৮-২২৯

১৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ২২৮-২২৯

১৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ২২৮-২২৯

১৮. মিত্র, শম্ভু, পৌষ ১৪১০, *চাঁদ বণিকের পালা,* কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৯. দেবরায়, শেখর, ডিসেম্বর ২০০২, *মনসাকথা,* আগরতলা, নবচন্দনা প্রকাশনী

২০. দে, সন্ধ্যা (সম্পাঃ), এপ্রিল ২০০৩, *অজিতেশ নাট্য সংগ্রহ, সওদাগরের নৌকা,* কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

২১. হোসেন, সেলিনা, মে ১৯৯৩, *চাঁদবেনে,* কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন

২২. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ১৯৯৩, *চাঁদবেনে,* কলকাতা, গ্রন্থালয়

২৩. কর, বিমল, ভাদ্র ১৩৯২, *বেহুলা,* কলকাতা, শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

২৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, জানুয়ারি ২০০৯, *গল্প ৫০,* কলকাতা, প্রকাশ ভবন

২৫. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ২০১০, *মনসা মঙ্গল,* কলকাতা, বর্ণ পরিচয়

২৬. চক্রবর্তী, অমলেন্দু, জানুয়ারি ২০১০, *চাঁদ-মনসার জোট,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা

২৭. দেবী, মহাশ্বেতা, ১৪১৪, *বেহুলার বারোমাস্যা* (গল্প সংগ্রহ), *বেহুলা* (গল্প), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ

২৮. দাশ, জীবনানন্দ, ১৩৮১, *রূপসী বাংলা* (কাব্য গ্রন্থ), *বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি* (কবিতা),কলকাতা, সিন্ডিকেট, পৃ. ১২

২৯. দে, বিষ্ণু, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪১৪, *কবিতা সমগ্র-২, এবং লখিন্দর,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৩১

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবিপ্রসাদ (সম্পাঃ), মার্চ ১৯৭৬, *সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বেহুলা,* কলকাতা, ভারবি, পৃ. ১৪২

৩১. মিত্র, অরুণ, জানুয়ারি ২০০২, *শ্রেষ্ঠ কবিতা, ও বেহুলা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২০৬

৩২. দেব, সব্যসাচী (সম্পাঃ), ২০০৪, *বীরেন্দ্রসমগ্র ১ম খণ্ড, লখিন্দর,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, পৃ. ১৪৬, ১৪৮, ১৬০

৩৩. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, জুলাই ১৯৮০, *শ্রেষ্ঠ কবিতা, মৃত্যুত্তীর্ণ* (কাব্য গ্রন্থ), *বেহুলা নাচানো স্বর্গ* (কবিতা), দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩২

৩৪. হায়দার, দাউদ (সম্পাঃ), বইমেলা ২০০৪, *বাংলাদেশের কবিতা, লখিন্দর* (কবিতা), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১১৫

৩৫. খান, রফিক উল্লাহ (সম্পাঃ), *বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা, বেহুলার ভেলা* (কবিতা), ঢাকা, একুশে পাবলিকেশনস, পৃ. ২১৬

৩৬. ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ, ১৯৯৫, *শ্রেষ্ঠ কবিতা, মনসা-মঙ্গল* (কবিতা),কলকাতা, প্রমা, পৃ. ১৫

৩৭. হুদা, মুহম্মদ নূরুল, ফেব্রুয়ারি ২০১২, *বেহুলার শাড়ি,* ঢাকা, সমাবেশ

৩৮. ঘোষ, শঙ্খ, আশ্বিন ১৩৯০, *হেতালের লাঠি* (কবিতা), কলকাতা, শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃ. ৪৯।

৩৯. বসু, কৃষ্ণা, ২০০৯, *একালের কবিতা সঞ্চয়ন, চাঁদ বণিকের ডিঙা* (কবিতা), কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৯৯

৪০. Derrida, Jacques, Reprint 2002, *Of Grammatology*, 'Translator's Preface', Gayatri Chakravorty Spivak (Translated), Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, P. p.xxxvi

টীকা

১. **Deconstruction** –এর বাংলা পরিভাষা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, "1988-তে, আজ থেকে বাইশ বছর আগে, আমি যখন দেরিদার উপর প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, আমি Deconstruction –এর যোগ্য পরিভাষা পাইনি। আমি ব্যবহার করেছিলাম 'নিরলংকরণ' যা আমার নিজেরই পছন্দ ছিল না। 'বিনির্মাণ' শব্দ গোড়া থেকে পরিত্যাগ করেছিলাম কারণ আমি জানতাম 'নির্মাণ' ও 'বিনির্মাণের' অর্থ এক। যদিও ঐ ভুল পরিভাষা এখানে চলছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় বিশ্বকোষ'-এ, যার থেকে ভালো বাংলা অভিধান আর নেই, 'বিনির্মাণ' শব্দটি, ঐ বিশ্বকোষে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু 'বিনির্মিত' শব্দটি আছে এবং তার তিনজোড়া, অর্থাৎ ৬টি অর্থ দেওয়া হয়েছে। ১. বিরচিত, কৃত ২. নিরূপিত, সৃষ্ট এবং ৩. কৃত ও দত্ত। (এখানে 'কৃত' শব্দটি দুবার দেওয়া হয়েছে)। যাই হোক, এই পাঁচটির কোনটাই 'নির্মাণে'র বিপরীত নয়। সুতরাং 'বিনির্মাণ' কোন মতেই Deconstruction-এর পরিভাষা হতে পারে না। ছয় কিম্বা সাত বছর আগে, আমার ঠিক সময়টা মনে নেই, শ্রীমতী গায়ত্রী স্পিভাক কলকাতায় এসেছিলেন।... আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়েছিলাম যে উনি ঐ পত্রিকার কোন রিপোর্টারকে ছোট ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন এবং কথায় কথায় বলেছিলেন যে ওঁরা 'বিনির্মাণ' শব্দটি ব্যবহার করেন না; তার বদলে ওঁরা বলেন 'অবিনির্মাণ'। এ-শব্দটি আমার পছন্দ এবং আমি এটাই ব্যবহার করেছি"।

[বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, ২০১৪, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক*, 'ভুমিকা', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃ. ১৮-১৯]

নবেন্দু সেন তাঁরই সম্পাদিত ‘পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা’ গ্রন্থের ‘ডি-কন্সট্রাকশন’ প্রবন্ধে লিখছেন, “Rereading ‘পুনর্পাঠ’ বোঝা গেল; কিন্তু Remaking পুনর্গঠন না হয়ে ‘বিনির্মাণ’ হল ? আবার ঐ একই বাংলা ‘Deconstruction’-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে ? যুক্তি, প্রতিযুক্তি দুই-ই তোলা যেতে পারে। বি-যুক্ত = অ-যুক্ত হলে বিনির্মাণ = অ-নির্মাণ ধরা যেতে পারে। তাহলে অ-বিনির্মাণ ? অস্পষ্টতা কী স্পষ্টতা পেল ? অস্পষ্টতাই স্পষ্টতা পেল। বোধগম্যতা জটিলতর হল। তাহলে ? স্পষ্টতার অপেক্ষায় বিষয়টি বুঝবার জন্য ভাষান্তরণ আপাতত স্থগিত রেখে মূল ব্যবহারকেই গ্রহণ করা যাক না। আমরা তাই ‘ডি-কন্সট্রাকশন’-ই ব্যবহার করেছি।

[সেন, নবেন্দু (সম্পাঃ), ২০১২, *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, ডি-কন্সট্রাকশন, কলকাতা, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৬৯]

ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার *(সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি*, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৪৩-২৪৪), ড. তপোধীর ভট্টাচার্য *(প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৯৭-১১৫), *(জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ*, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৩), ড. বিমলকুমার মুখপাধ্যায় *(সাহিত্য বিবেক*, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২২০-২২৬) প্রমুখ তাত্ত্বিক অবশ্য যুক্তি সহকারেই ‘বিনির্মাণ’ শব্দটি ‘Deconstruction’–এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

প্রাথমিক সহায়কগ্রন্থ

১. আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ (সম্পাঃ), ২০০৮, *পূর্বঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকিনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ*, ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলিকেশনস।

২. আচার্য, ফণিভূষণ, ১৪০৩, *আমিই অভিমন্যু আমিই লখিন্দর*, কলকাতা, বিকাশ গ্রন্থ ভবন।

৩. কর, বিমল, ভাদ্র ১৩৯২, *বেহুলা*, কলকাতা, শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা।

৪. খান, রফিক উল্লাহ (সম্পাঃ), *বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা*, ঢাকা, একুশে পাবলিকেশনস।

৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ২০০৯, *অমাবস্যার গান*, সুবর্ণ সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্র্ কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৬. ঘোষ, শঙ্খ, ১৩৯০, *হেতালের লাঠি* (কবিতা), কলকাতা, শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা।

৭. ঘোষ, শঙ্খ, ২০১১, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৮. চক্রবর্তী, অমলেন্দু, ২০১০, *চাঁদ-মনসার জোট*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৯. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, ১৯৮০, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১০. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, ২০০৯, *গল্প ৫০*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাঃ), ১৯৭৬, *সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা। ভারবি।

১২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাঃ),২০০৯, *বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল*, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স।

১৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাঃ), ২০০২, *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স।

১৪. বসু, কৃষ্ণা, ২০০৯, *চাঁদ বণিকের ডিঙা* (কবিতা), *একালের কবিতা সঞ্চয়ন*, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫. ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ, ১৯৯৫, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, প্রমা।

১৬. ভট্টাচার্য, শ্রীবিজনবিহারী (সম্পাঃ), ২০১১, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*, দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি।

১৭. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ২০১০, *মনসা মঙ্গল*, কলকাতা, বর্ণ পরিচয়।

১৮. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, এপ্রিল ১৯৯৩, *চাঁদবেনে*, কলকাতা, গ্রন্থালয়।

১৯. মিত্র, অরুণ, জানুয়ারি ২০০২, *শ্রেষ্ঠ কবিতা, ও বেহুলা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

২০. মিত্র, তন্ময় মীর রেজাউল করিম, সুবোধ কুমার যশ (সম্পাঃ),২০১০, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২১. মিত্র, শম্ভু, ১৪১০, *চাঁদ বণিকের পালা*, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২২. দাশ, জীবনানন্দ, ১৩৮১, *রূপসী বাংলা*, কলকাতা, সিন্ডিকেট।

২৩. দাশগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাঃ), ১৯৬২, *বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ,* কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪. দাশগুপ্ত, তমোনাশ (সম্পাঃ), ১৯৯৩, *নারায়ণ দেব বিরচিত পদ্মাপুরাণ*, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৫. দে, বিষ্ণু, ১৪১৪, *কবিতা সমগ্র-২*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

২৬. দে, সন্ধ্যা (সম্পাঃ), ২০০৩, *অজিতেশ নাট্য সংগ্রহ, সওদাগরের নৌকা*, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

২৭. দেব, চিত্রা ও অক্ষয়কুমার কয়াল (সম্পাঃ), ১৩৮৪, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*, কলকাতা, লেখাপড়া।

২৮. দেব, সব্যসাচী (সম্পাঃ), ২০০৪, *বীরেন্দ্রসমগ্র ১ম খণ্ড*, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

২৯. দেবরায়, শেখর, ২০০২, *মনসাকথা*, আগরতলা, নবচন্দনা প্রকাশনী।

৩০. দেবী, মহাশ্বেতা, ১৪১৪, *বেহুলার বারোমাস্যা*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ।

৩১. দেবী, মহাশ্বেতা, ১৯৯৪, *বেনে বৌ*, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী।

৩২. হায়দার, দাউদ (সম্পাঃ), ২০০৪, *বাংলাদেশের কবিতা*, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩৩. হুদা, মুহম্মদ নূরুল, ২০১২, *বেহুলার শাড়ি*, ঢাকা, সমাবেশ।

৩৪. হোসেন, সেলিনা, ১৯৯৩, *চাঁদবেনে*, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন।

গৌণ সহায়কগ্রন্থ

১. দত্ত, জয়িতা (সম্পাঃ), *পুরোনো বাংলা সাহিত্য চিন্তা ও চর্চা*, কলকাতা, রত্নাবলী।

২. প্রামানিক, বর্ণালী, ২০১২, *লোক ঐতিহ্যের দর্পণে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্য*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, ২০১৪, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, ২০০১, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, ১৩৬৭, *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৬. বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদিত), ২০১২, *প্রতিবাদের উপন্যাস*, কলকাতা, বাংলার মুখ।

৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ২০০৯, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৮. ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার, ২০১২, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর*, কলকাতা, বাকপ্রতিমা।

৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০৬, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১০. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০১৩, *জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১১. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, ২০০৬, *সাহিত্য বিবেক*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, ২০০৩, *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১৩. মণ্ডল, সন্দীপকুমার, ২০১২, *শ্রীকবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য (ভূমিকা, পাঠান্তর, টীকা),* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১৪. রায়, দেবেশ, ২০০৩, *উপন্যাস নিয়ে,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১৫. সেন, অঞ্জন, শেখ মকবুল ইসলাম (সম্পাঃ), ২০১২, *সর্প-সংস্কৃতি ও মনসা*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

১৬. সেন, সুকুমার, ১৪০৭, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১৭. সেনমজুমদার, জহর, ২০০৯, *মধ্যযুগের স্বর ও সংকট*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

18. Abrams, M H, 2012, *A Glossary of Literary Terms*: Delhi, Macmillan Publishers India Ltd.

19. Bauer, D.M, 1988, *Feminist Dialogics: A Theory of Failed Community Albany*, New York, State University of New York Press.

20. Barthes, Roland, 2007, *Critique Et Verite*, UK, The Athlone Press.

21. Camus, Albert, 1991, *The Plague* (Original: 'La Peste', 1947), UK, Vintage International Series, Penguin.

22. Derrida, Jacques, 1978, *Edmund Husserl's 'Origin of Geometry: An Introduction* (1962), (Trans.) John P. Leavey, University Press, Pittsburgh, Duquesne.

23. Derrida, Jacques, 1973, *Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory of Signs* (1967), (Trans.) Devid B. Allison: North Western University Press.

24. Derrida, Jacques, 2002, *Of Grammatology* (1967), (Trans.) Gayatri Chakravorty Spivak, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited.
25. Derrida, Jacques, 1978, *Writing and Difference* (1967), (Trans.) Alan Bass, Routledge and Kegan Paul, London.
26. Derrida, Jacques, 1981, *Margins of Philosophy*, (Trans.) Barbara Johnson: Athlone Press, London.
27. Derrida, Jacques, 1990, *Glas* (Paperback), America West, University of Nebraska Press.
28. Derrida, Jacques, 1987, *The Truth in Painting* (1978), (Trans.) Geoff Bennington and Ian Mcleod, Chicago University Press: Chicago.
29. Derrida, Jacques, 1987, *The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond* (1980), (Trans.) Alan Bass, Chicago University Press: Chicago.
30. Derrida, Jacques, 1992, *Acts of Literature*, Derek Attridge (Ed.), London, Routledge.
31. Foucault, Michel, 1988, *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*, New York, Abridged (Paperback Edition).
32. Foucault, Michel, 1994, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, UK, Vintage Book Series, Penguin.
33. Hobsbawm, Eric, 8April 2010, *Palmiro Togliatti: A Biography by Aldo Agosti translated by Vanna Derosas and Jane Ennis and IL sarto di Ulm: Una possibili storia del PCI by Lucio Margi*, UK, London Review of Books, Vol.32, No.8.
34. Levi-Strauss, Claude, 1963, Author's Preface to the French Edition, *Structural Anthropology*, UK, Hachette.

35. Sartre, Jean-Paul, 1965, *Situations* (English Ed.), New York, George Braziller.